বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ

সৈয়দ শামসুল হক

ঐতিহ্য

প্রথম খণ্ডের উৎসর্গপত্র

শাহ সৈয়দ আলী মাহমুদ
আমার দ্বাদশতম পূর্বপুরুষ

অখণ্ড সংস্করণের উৎসর্গপত্র

শাহ সৈয়দ আলী মাহমুদ
আমার দ্বাদশতম পূর্বপুরুষ

সৈয়দ হায়দার আলী
আমার বড় বাবা

সৈয়দ সিদ্দিক হুসাইন
আমার বাবা

সৈয়দ ইদ্রিস হুসাইন
আমার চাচা

স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে
কে বাঁচিতে চায়?
বলো, দাসত্ব শৃঙ্খল কে পরিবে পায় হে
কে পরিবে পায়?

—রঙ্গলাল বন্দোপাধ্যায়

Time present and time past
Are both perhaps present in time future
And time future contained in time past
If all time is eternally present
All time is unredeemable.
What might have been is an abstraction
Remaining a perptual possibility
Only in a world of speculation.
What might have been and what has been
Point to one end, which is always presnt.

—T S Eliot

কে না বৃষ্টির অপেক্ষা করে এই বাংলাদেশে? কৃষক অপেক্ষা করে, বধূ অপেক্ষা করে, কবি অপেক্ষা করে। বৃষ্টির জন্য কৃষক অপেক্ষা করে থাকে; মাটি সরস হয়ে উঠবে, শস্যদানার দুধ ঘন হয়ে উঠবে, এবং তার হৃদয়ের ভেতরে আশার এই শস্যও রোপিত হয়ে যাবে যে, এবারের ফসলে সে গত সনের ঋণ শোধ করেও সচ্ছল চলতে পারবে। বৃষ্টির জন্য নববধূ অপেক্ষা করে থাকে; নদী যৌবন ফিরে পাবে, কূল প্লাবিত হয়ে যাবে, মরা খাল আবার ভরে উঠবে এবং তার শ্বশুরবাড়ির পাশ দিয়ে প্রবাহিত খালটিতে বাপের বাড়ির নৌকা এসে লাগবে তাকে নাইওর নিয়ে যাবার জন্য। বৃষ্টির জন্য কবি অপেক্ষা করে থাকে; মেঘ, বর্ষণ ও বিদ্যুৎ তাকে জীবনের সংবাদ দেবে, মিলনের সংবাদ দেবে, এবং সমস্ত কিছুর অন্তঃস্তল থেকে তাকে এই সংবাদটিও দেবে যে, স্মৃতিই মানুষের চূড়ান্ত সম্পদ; স্মৃতি ও কল্পনা—প্রতিভা থেকেই আমাদের নির্মাণ করে নিতে হয় সম্মুখ।

গ্রীষ্মের পুড়ে যাওয়া নিসর্গের ভেতরে দাঁড়িয়ে অগ্নিকুণ্ডের মতো আকাশের নির্মমতার দিকে তাকিয়ে থাকে কৃষক—কখন বর্ষার মেঘ দেখা দেয়।

কঠিন সংসারে ক্রীতদাসীর মতো রাত্রিদিন কর্মে নিযুক্ত থেকে, প্রীতি, পুরস্কার, স্বস্তি ও নিরাপত্তাহীন প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে নববধূ চকিতে একেকবার আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করে মেঘ কখন বর্ষার দেখা দেয়।

মৃত্যু, বিচ্ছেদ, স্তব্ধতার ভেতরে যখন মনে হতে থাকে যে, আর জীবন নেই আর মিলন নেই, আর কোনো সন্তাপহর ধ্বনি নেই, কবি একটি প্রধান ধ্বনির জন্য তখন কান পেতে থাকে— কখন বর্ষার মেঘ গুরুগুরু করে ওঠে।

এবং দিগন্তে যদি দেখা না দেয় রাজহংসীর মতো মেঘ, যদি শোনা না যায় গোপী যন্ত্রের মতো টঙ্কার, যদি পতিত না হয় নিদ্রার ভেতরে সুস্বপ্নের মতো জলধারা; যদি মানুষের ত্বক ফেটে যায়, মাটি চৌচির হয়ে যায়, মধ্যরাতেও আকাশ উনুনের মতো রক্তাক্ত হয়ে থাকে, বৃক্ষ আন্দোলিত না হয়, নদী প্রবাহিত না হয় এবং শস্যের খোসার ভেতরে ছাই ভরে যেতে থাকে; মানুষেরা মাঠে সমবেত হতে থাকে এবং আগুনের ভেতরে কাতার বেঁধে তারা

দাঁড়ায় বৃষ্টির নামাজের জন্য; মানুষেরা কবির চারপাশে ঘন হয়ে আসে এবং কবি বৃষ্টির জন্য গান করে; বধূরা কুড়ুয়া পক্ষির ডাক শোনে এবং অশ্রুপাত করে।

আল্লাহ যদি মানুষের মোনাজাত না গ্রহণ করেন, মেঘ যদি কবির বিনতি না শ্রবণ করে, মাটি যদি এত অশ্রুতেও প্লাবিত না হয়, মানুষ তো তবুও মরে যায় না; মানুষের আশা এবং প্রতীক্ষা মরে না; ভাই প্রাণত্যাগ করে, জননী প্রাণত্যাগ করে, বোন প্রাণত্যাগ করে, জনক প্রাণত্যাগ করে, সন্তান প্রাণত্যাগ করে, কিন্তু মানুষ প্রাণত্যাগ করে না; মোনাজাতের হাত নেমে আসে, গানের স্বর স্তব্ধ হয়ে যায়, অশ্রুও শুকিয়ে যায়, কিন্তু কাল স্তম্ভিত হয়ে যায় না। কাল অগ্রসর হয়, এবং এই বৎসরও অতীত হয়ে যায়, এবং এই অনাবৃষ্টিও স্মৃতিতে পর্যবসিত হয়, এবং আবার এই বাংলাদেশে বৃষ্টির অপেক্ষা করে থাকে নববধূ, বৃষ্টির অপেক্ষা করে থাকে কবি।

এবারের এই গ্রীষ্মে আরও একটি দল বৃষ্টির অপেক্ষা করে। গেরিলারা অপেক্ষা করে।

এদের ভেতরে দু'জন-উপস্থিত ছিল উনিশ শ' একাত্তরের বিশ ও একুশ ফেব্রুয়ারির মধ্যরাতে ঢাকায় কেন্দ্রীয় শহিদ মিারে।

ভাষা আন্দোলনের শহীদদের প্রতি জাতির পক্ষ থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করে ফিরে তাকালেন মিনার চত্বরে অগ্নিমশাল হাতে দাঁড়ানো হাজার ছাত্রছাত্রীদের দিকে—তারা এখন মিছিল করে নগর পরিক্রমা করবে, তারপর আবার তিনি মিনারের দিকে চোখ ফেরালেন, মিনারের বিমূর্ত স্থাপনায় শোকে অবনত দেশ-জননী ও তার সন্তানের দিকে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ, ঠোঁট যেন নড়ে উঠল তার একবার, যেন কী বলতে চাইলেন, কিন্তু বলতে পারলেন না, বাম হাত দিয়ে মাথার ঘন চুল বুলিয়ে নিলেন, ডান হাত দিয়ে চোখের মোটা কালো ফ্রেমের চশমা খুলে ওই হাতেরই পিঠ দিয়ে চাপ দিলেন নিজের দু'চোখে, তার পরমুহূর্তেই মিনারের ধাপগুলো পেরিয়ে দ্রুতপায়ে নেমে এলেন নিচে, দাঁড়ালেন মিছিলের সমুখে, আকাশে অগ্নিকণার মতো জ্বলজ্বল করছে নক্ষত্র, অশ্বের মতো অস্থির অপেক্ষমাণ মিছিল, নিচে দাউদাউ করে জ্বলছে প্রতিটি হাতে মশাল, বঙ্গবন্ধু এখুনি উচ্চারণ করবেন সে মিছিলের যাত্রাবাক্য, অথচ তিনি এখনও নীরব, তাঁর এ নীরবতা মিছিলের প্রতিটি মানুষের কাছে শতাব্দীসমান বলে মনে হলেও তিনি যে ওই একটি মুহূর্তের ভেতরে পরিক্রম করে এলেন বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাস, সংঘ, সংগ্রাম, স্মরণ করে উঠলেন বড় দীর্ঘ কাতারে

দাঁড়ানো অতীত বীরগণকে, স্পর্শ করলেন অযুত শহীদের রক্ত, তাঁর চোখ যে ভিজে উঠল, কণ্ঠনালিতে রুদ্ধবাষ্পের যে প্রবল চাপ তিনি অনুভব করলেন, সে কথা আমরা জানতেও পারব না, কারণ তিনি শেষ করে যেতে পারবেন না তাঁর আত্মজীবনী রচনা, তার আগেই তিনি নিহত হবেন; পেছন ফিরে আমরা দেখতে পাব, এই মধ্যরাত থেকে আর মাত্র তেত্রিশটি মধ্যরাত পরেই ভূমিষ্ঠ হবে যে স্বাধীন বাংলাদেশ— সে জাতক যে ক্রন্দন করে উঠবে তিরিশ লক্ষ কণ্ঠে— মিনার চত্বরে মিছিলের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বঙ্গবন্ধু ওই নীরব মুহূর্তটিতেই যেন আসন্ন ভবিষ্যতের কররেখা পাঠ করে হয়ে উঠলেন তাদের প্রতিনিধি; পরাধীন বাংলাদেশের শেষ একুশে ফেব্রুয়ারির মধ্যরাতে, অগ্নিমশাল ওই তরুণদের উদ্দেশে তিনি বলে উঠলেন— দূর উত্তর থেকে রাজধানীতে আগত সেই যুবক দু'টি যখন নিজ এলাকায় ফিরে যাবে আরও একদিন পরে, যখন ইস্টিশানের চায়ের দোকানে আড্ডায় তাদের ঘিরে ধরবে বন্ধুরা, তারা শহিদ মিারে বঙ্গবন্ধুর কথাগুলো স্মৃতি থেকে প্রায় অক্ষরে অক্ষরে তাদের শোনাতে পারবে, কারণ, বঙ্গবন্ধুকে সেই তাদের জীবনে প্রথম দেখা।

'মধ্যরাতে এই শহিদ মিনারে দাঁড়িয়ে আল্লাহর নামে আমি শপথ নিয়ে বলছি, তাঁদের রক্তের ঋণ আমি শোধ করবই। শহীদের আত্মা আজ বাংলার ঘরে ঘরে ফরিয়াদ করে ফিরছে, বাঙালি তুমি কাপুরুষ হয়ো না।'

'সামনে আমাদের কঠিন দিন। আমি আপনাদের মাঝে নাও থাকতে পারি। মানুষকে তো একদিন মরতেই হয়। আমি জানি না, আবার কবে আপনাদের সামনে দাঁড়াতে পারব। তাই আজ আমি আপনাদের এবং সারা বাংলার মানুষকে ডেকে বলছি, চরম ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হন। বাঙালি যেন আর অপমানিত লাঞ্ছিত না হয়। শহীদদের রক্ত যেন বৃথা না যায়।'

একাত্তরের একুশে ফেব্রুয়ারি উপলক্ষে নিছক কৌতূহলবশত রাজধানীতে এসেছিল এই যে দু'টি তরুণ, তারা কি তখনো জানত আর মাত্র কয়েক সপ্তাহ পরেই তাদের পরিণত হতে হবে গেরিলায়?

রাজধানীতে ঢলভাঙা মানুষের মিছিল ও দিকে দিকে বিরামহীন 'জয় বাংলা' 'পদ্মা-মেঘনা-যমুনা, তোমার আমার ঠিকানা' 'স্বাধীন করো, স্বাধীন করো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো' কোরাস কি এই দু'টি তরুণের কাছে মনে হয়েছিল বিশাল এক মেলার মতোই রঙিন ও কলরবমুখর?

তারপর, তিন সপ্তাহের মাথায়, যখন তাদের শহরে পত্রিকা যেমন আসে একদিন পরে, এবং চোদ্দই মার্চে দেয়া বঙ্গবন্ধুর পঁয়ত্রিশটি নির্দেশনামার পাশে তাঁর বিবৃতি প্রকাশিত হয় পত্রিকায়, এই তরুণ দু'টির একজন তা চায়ের

দোকানে পাঠ করে শোনায় উচ্চৈঃস্বরে; তরুণটি কলেজের বাৎসরিক নাটকে অভিনয় করে গত বছরেই মেডেল পেয়েছিল—সে যখন বঙ্গবন্ধুর বিবৃতি পাঠ করছিল আবেগ কম্পিত উচ্চারণে শ্রোতাদের কি এমন মনে হচ্ছিল, এ কোনো ঐতিহাসিক নাটকের সংলাপ?

'জনগণের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম এগিয়ে চলেছে। মুক্তিকামী মানুষ বিশ্বের সবখানে যাঁরা প্রাণপণ লড়াই করে যাচ্ছেন মুক্তির জন্য, আমাদের সংগ্রামকেও তাঁদের নিজেদের বলে গণ্য করা উচিত। শক্তির সাহায্যে যারা শাসনের চক্রান্ত করে তাদের বিরুদ্ধে দৃঢ়সংকল্প ও সংঘবদ্ধ জনশক্তি কেমন করে মুক্তির দুর্জয় দুর্গ গড়ে তোলে, আমাদের জনগণ তা প্রমাণ করেছে।'

'আজ বাংলাদেশের প্রতিটি নারী-পুরুষ এমনকি শিশু পর্যন্ত মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার সাহসে বলীয়ান। নগ্নভাবে শক্তিপ্রয়োগ করে মানুষকে দলিত করার কথা চিন্তা করেছিল যারা, তারা নিশ্চয়ই পরাভূত হয়েছে। বাংলাদেশের প্রতিটি স্তরের মানুষ-সরকারি কর্মচারী, অফিস আর কলকারখানার শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র সবাই দৃপ্তদম্ভে ঘোষণা করেছে—তারা আত্মসমর্পণের চেয়ে মরণ বরণ করতেই বদ্ধপরিকর।'

কিন্তু এর মাত্র এগারোটি দিন পরে, বাংলাদেশের নিরস্ত্র মানুষের ওপর সাম্প্রতিক বিশ্বের বৃহত্তম গণহত্যা শুরু হয়ে যাবার পর আরও অনেকের মতো আমাদের এই তরুণকেও চমকে উঠতে হবে—এবং সে আবিষ্কার করবে, ঐতিহাসিক কোনো নাটকের মঞ্চে নয়— ঘটমান ইতিহাসেরই মঞ্চে অকস্মাৎ তারা এখন স্থাপিত, এ এমন যেখানে মৃত্যুর অভিনয় নয়— মৃত্যু; এর মাত্র এক মাস তিন দিন পরেই তাদের ত্যাগ করতে হবে গৃহ, ত্যাগ করতে হবে শহর, ত্যাগ করতে হবে সারল্য, মাত্র এক রাত্রির ব্যবধানে তাদের হয়ে উঠতে হবে সাবালক, তুচ্ছ হয়ে যাবে তাদের মৃত্যুভয়, শিক্ষা নিতে হবে অস্ত্রচালনার, তারা স্থাপিত হবে সাম্প্রতিক বিশ্বের ব্যাপকতম এক মুক্তিযুদ্ধে, তারা নিজেদের দেখতে পাবে ঐতিহাসিক নাটকে নয়, ঘটমান ইতিহাসেরই মঞ্চে, এবং এ এমন এক মঞ্চ যেখানে যুদ্ধের অভিনয় নয়—যুদ্ধ।

এবং শত্রুর বিরুদ্ধে সশস্ত্র চূড়ান্ত আঘাত হানবার জন্য তাদের অপেক্ষা করতে হবে বৃষ্টির।

তাদের এ অপেক্ষা এমন নয় যে, তারা একটি বনভোজনের স্থলে অপেক্ষায় আছে;— প্রতিদিন তাদের রেকি আছে, অপরাপর গেরিলা দলের

সঙ্গে যোগাযোগ আছে, কখনো নিজদল আর কখনো অপর দলের সঙ্গে একত্র যুদ্ধ আছে, শত্রুর ওপর অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়া আছে, শত্রুর অস্ত্র দখল করে নিজেদের অস্ত্রাগার বৃদ্ধি করা আছে, জয় আছে, পরাজয় আছে, আহত আছে, নিহত আছে, গ্রামবাসীদের সঙ্গে যোগাযোগের বিষয় আছে, স্বজাতির ভেতরেই দালাল ও রাজাকার আছে, তাদের শাস্তিবিধান আছে, বিচার আছে, দণ্ড কার্যকর করা আছে। কিন্তু সে বিবরণের জন্য আমরা অপেক্ষা করব যখন এই যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবে; তখন আমরা পেয়ে যাব ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইলের পলি জাতক শত সহস্র জীবিত মুক্তিযোদ্ধাদের স্মৃতিকথা; আমরা দেখতে পাব, বিশ্বের এই একটি দেশ—বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিকথায় আমাদের পাঠাগার বিপুল ভরে উঠছে প্রতি বৎসর—একটি যুদ্ধের এত স্মৃতিকথা এত অল্পকালের ব্যবধানে বুঝি বিশ্বের আর কোথাও রচিত হয়নি— এবং হ্যাঁ, এ কথাও বলতেই হয়, আমরা অনুতাপ করব এই দেখে যে, সেইসব কথনের কোনো কিছুই আমাদের প্রতিদিনের পদপাতের ভেতরে গ্রহণ করছি না, আমরা এমন আচরণ করছি যেন মুক্তিযুদ্ধ আমরা আদৌ করিনি— হ্যাঁ, এ সকল কথা বলতেও আমাদের হৃদয় থেকে অবিরল ধারায় ক্ষরিত হয় রক্ত।

থাক সে শোক। আমরা এখন দ্রুতপায়ে পৌঁছে যাই বাংলাদেশের দূর উত্তরে, যেখানে প্রকৃতি উদাস, যেখানে দারিদ্র্য চরম, যেখানে প্রান্তর হা হা করে গ্রীষ্মের দিগন্ত পর্যন্ত, ধুলো ওড়ে, ধুলোয় ডুবে যায় পথিকের পা, মরে যায় নদী, তারপর যেখানে বর্ষার মেঘ আসে, বর্ষার মেঘ এসে হিমালয় সন্নিকট অনুভব করে থমকে দাঁড়ায় এবং ভীত হয়ে বুকের সমস্ত জল নিঃশেষে ঢেলে দেয় দিবারাত্রি অবিরাম, ধুলোরাশি হয়ে ওঠে ঘন কালো কাদা, পথিকের পা প্রতি পদপাতে প্রোথিত হয়ে যায় কাদায়, খলখল করে ওঠে নদী, ঢল নামে তীব্র প্রবল উন্মুক্ত— এখন আমরা সেই উত্তরে যাই, উত্তরের প্রাচীন একটি জনপদে যাই, জলেশ্বরীতে যাই, জলেশ্বরীর একটি গ্রামে যাই—যেতে হবে আমাদের সন্তর্পণে, এখন এ যুদ্ধের কাল, যেতে হবে আমাদের টহলদার মিলিটারির দৃষ্টি এড়িয়ে, এখন এ গণহত্যার কাল; গ্রামটির নাম বকচর; লোকশূন্য এখন এ গ্রাম; এখানেই গোপন ডেরা স্থাপন করেছে মুক্তিযোদ্ধাদের একটি দল, জলেশ্বরী কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক মহিউদ্দিনের নেতৃত্বে; এবং আমরা প্রবেশ করি প্রাচীন একটি কিংবদন্তির ভেতরে এবং আমরা প্রত্যক্ষ করি নতুন একটি কিংবদন্তির জন্ম।

২

মহিউদ্দিন শুকনো একটি কঞ্চি কুড়িয়ে নেয়, ভেঙে সেটা ছোট করে এবং পা দিয়ে পায়ের নিচে মাটি থেকে পাতাপত্তর সরিয়ে উবু হয়ে বসতে বসতে সেই কঞ্চি দিয়ে একটি নকশা রচনা করতে থাকে। তার সঙ্গীরাও ক্রমশ তাকে ঘিরে বসে পড়ে, ঘন বাঁশবনের পাশে, পরিত্যক্ত এই গৃহস্থ বাড়িটির বাইর প্রাঙ্গণে।

মহিউদ্দিন প্রথমে একটি ঘোড়ার নাল আঁকে, এবং অচিরেই নালের খোলা দুই মুখের দুই দিকে লম্বা করে লাইন টেনে দিয়ে স্মিতমুখে সঙ্গীদের দিকে তাকায়।

মহিউদ্দিন প্রশ্ন করে, 'কী এটা?'

কেউ কেউ অনুমান করতে পারলেও মুখে কিছু বলে না, মহিউদ্দিনও সত্যি সত্যি এ প্রশ্নের কোনো উত্তর আশা করে না, কারণ এ প্রশ্ন তার বক্তব্যের ভূমিকাসূচক অলঙ্কার মাত্র।

মহিউদ্দিন দাগের ওপর কঞ্চি আরেকবার বুলিয়ে বলে, 'এই হচ্ছে আধকোশা নদী, এই হচ্ছে নদীর গতিপথ।' সে তার বাঁ দিকের সরল রেখাটির বাইরের প্রান্ত থেকে আবার শুরু করে দেখাতে। 'এখানে কাঁঠালবাড়ি। এই কাঁঠালবাড়ি থেকে আধকোশা নদী ধরে আমরা এখন এসেছি, এই এগিয়ে আসছি কাঁঠালবাড়ি ছেড়ে, পলাশবাড়ি ছেড়ে, এই এসে বল্লার চরে থামলাম। এটা বল্লার চর।' মহিউদ্দিন কঞ্চি বুলিয়ে ঘোড়ার নালের বাঁ দিকের মুখে এসে থামে এবং জায়গাটিতে কয়েকবার কঞ্চির আছাড় মারে। বলে, 'বল্লার চর এইখানে। এবার এই নদী উত্তর দিকে উঠছে, এই নেমে এসে পুরো জলেশ্বরী ঘুরে আবার দক্ষিণ দিকে বাঁক নিল।' মহিউদ্দিন কঞ্চি বুলিয়ে সম্পূর্ণ ঘোড়ার নালটি আবার দেখায়। 'এই জলেশ্বরী ছেড়ে দিয়ে সোজা পূর্ব দিকে মান্দারবাড়ি পর্যন্ত আধকোশা নদী চলে গেছে।' মহিউদ্দিনের কঞ্চি এখন গোড়ার নালটির ডান দিকের সরল রেখার শেষ প্রান্তে এসে বাতাসে উঠে যায়। 'মান্দারবাড়ির পরে নদী আবার দক্ষিণ দিকে খাড়া নেমে গেছে, কিন্তু সে আমাদের দরকার নেই। আমাদের দরকার জলেশ্বরী, যে জলেশ্বরী ঘিরে আধকোশা নদী বেরিয়ে গেছে।'

সঙ্গীরা মনোযোগের সঙ্গে নকশাটি দেখতে থাকে। তাদের সবারই জন্ম জলেশ্বরীতে, এই আধকোশা নদী কতবার তারা দেখেছে, কতবার এ নদীতে সাঁতার কেটেছে, এর ঝাউবনের ভেতরে কতদিন তারা বনভোজন করেছে,

সেসব আরেক জীবনের কথা; আধকোশাকে এখন তাদের প্রত্যেকের কাছেই নতুন এক নদী মনে হয়। মনে হয়, এ নদী তারা কখনো দেখেনি, এবং এই প্রথম তারা এর পরিচয় পাচ্ছে।

সুলতান হঠাৎ খুকখুক করে হেসে ওঠে; মহিউদ্দিন তার দিকে স্মিত চোখে তাকায়। সুলতানের স্বভাব এই যে, যখনই সে কিছু একটা অনুমান করে নেয় এবং অনুমানটি যখন তার বেশ মনঃপূত হয়, সে খুকখুক করে হাসে, বারবার সকলের মুখের দিকে তাকায় আর হাসে, হাসতে থাকে।

মাহিউদ্দিন সুলতানের কাঁধে কঞ্চির ছোট একটি আঘাত করে, ফলে হাসিটা আরও বেড়ে যায় সুলতানের। মহিউদ্দিনও হাসতে থাকে তখন।

হাসতে হাসতেই মহিউদ্দিন বলে, 'সুলতান ঠিক বুঝতে পেরেছে আমাদের কৌশলটা কী হবে। ঘোড়ার নালের দুই মুখে আছে পশ্চিম বল্লার চর, পূর্বে হাগুরার হাট, আর নালের পেটের ভেতর জলেশ্বরী। আমরা জানি আধকোশা নদী বয়ে এসে এই বল্লার চরে ধাক্কা মারে, তারপর পথ বন্ধ দেখতে পেয়ে উত্তরে বাঁক নেয়, বল্লার চরে ধাক্কা মারতে মারতে সেখানে একদিকে পড়েছে চর, আরেক দিকে হয়ে গেছে একটা খাত, যে খাত দিয়ে নদী কিছুদূর এগিয়ে আবার ঘুরে যায়। বল্লার চরের এই খাতটি, আমরা যারা বল্লার চর চিনি, আমরা জানি, প্রায় সিকি মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত। এই সিকি মাইলের পর সোজা আর এক মাইল হেঁটে গেলেই আমরা পৌঁছে যাই হাগুরার হাটে, যেখানে নদী জলেশ্বরী বেড় দিয়ে এসে পুবে বেরিয়ে গেছে। এখন এই বল্লার চরের খাতটি যদি লম্বা হয়ে হাগুরার হাট পর্যন্ত যায়, আধকোশা তাহলে আর জলেশ্বরী বেড় না দিয়ে, সোজা উত্তর থেকে নেমে বল্লার চর-হাগুরার হাট যোগ করে পুবে চলে যেতে পারে।'

আলম প্রশ্ন করে, 'তাতে আমাদের কী হবে?'

'এখনও বুঝতে পারছিস না?'

আলম হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। সুলতান আবার খুকখুক করে হেসে ওঠে, আলমের পাঁজরে খোঁচা দেয়।

আলম ক্ষেপে গিয়ে বলে, 'খুব চালাক মনে করিস নিজেকে, না?'

মহিউদ্দিন বলে, 'ডিসিপ্লিন, সুলতান। ডিসিপ্লিন, আলম। আমরা এখন সকলেই সৈনিক, আমরা এখন জরুরি একটা পরামর্শে বসেই, সৈনিকের ডিসিপ্লিন আমাদের না থাকলে আমরা কোনো কাজেই সফল হতে পারব না। আমরা সবাই এখন একসঙ্গে বসেছি একটা কৌশল নিয়ে আলোচনা করতে। আমি আমার বক্তব্য শেষ করার পর, সবাই মিলে দেখব কৌশলটি বাস্তব কি

না, কৌশলটি প্রয়োগ করবার মতো শক্তি আমাদের আছে কি না, কিংবা এর চেয়ে ভালো কৌশল কারো মাথায় আসে কি না। আমাদের এই কৌশলের ওপর নির্ভর করছে জলেশ্বরীকে শত্রুর কবল থেকে আমরা মুক্ত করতে পারব কি না। অতএব সুলতান, তোমার হাসি বন্ধ করো, ভাই। হাসবে তো তখন, যখন জলেশ্বরীতে আমরা জয়বাংলার নিশান ওড়াতে পারব।'

সকলের মুখ একসঙ্গে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, ঝুঁকে পড়ে সকলেই এখন মাটিতে আঁকা নকশাটির দিকে মনোযোগ দেয়।

মহিউদ্দিন বলে, 'আমরা জানি, বৃষ্টির মৌসুমে আমাদের এই আধকোশা নদী কী ভীষণ মূর্তি ধারণ করে। রাতারাতি নদী ফুলে ওঠে, চওড়া হয়ে যায়, প্রায় এক মাইল চওড়া হয়ে যায় বলেই এই নদীর নাম আধকোশা, আর সেই এক মাইল চওড়া নদী গিয়ে কলকল খলখল করে বয়ে যেতে থাকে প্রচণ্ড সব ঘূর্ণি বুকে নিয়ে বৃষ্টির পানি; সেই স্রোতের মুখে সমস্ত কিছু ডুবে যায়, ভেসে যায়, সবকিছু ভেঙে গুঁড়িয়ে ধসিয়ে দিয়ে নদী বয়ে যায়। আধকোশা নদীর এই চেহারার কথা শত্রুরা জানে না, তারা এদেশের নয় বলেই তাদের জানবার কথা নয়। তাছাড়া আধকোশা নদী এমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ নয় বলেই, আমার মনে হয় না পাকিস্তানি মিলিটারিরা এর তেমন খোঁজ রাখে, বা হিসাবের মধ্যে রাখে। বছরের যে দশটি মাস আধকোশা শুকিয়ে সুতোর মতো পড়ে থাকে, আমার অনুমান, ওরা সেটাকেই বরাবরের চেহারা বলে মনে করে।'

আলম বলে, 'কিন্তু মিলিটারি বাইরের হলেও আমাদের দেশের লোক তো কিছু কিছু তাদের সঙ্গে আছে, তাদের দালালি করছে, সেই দালালগুলো তো আধকোশার চেহারা বর্ষায় কী হয় জানে।'

মহিউদ্দিন হেসে বলে, 'আমার মনে হয় না যে, আমি যা ভাবছি ওদের মাথায় তা আসবে। আমি ভাবছি, বৃষ্টির মৌসুমে যখন আধকোশা ফুলে উঠবে, তার স্রোত ভীষণ হয়ে উঠবে, যখন সেই স্রোত জলেশ্বরীকে বেড় দিয়ে বল্লার চর থেকে হাগুরার হাট পর্যন্ত যাবে, তখন যদি কোনক্রমে ঘোড়ার নালের দুই মুখের মাঝের জায়গাটি বিচ্ছিন্ন করে ফেলা যায়, যদি এই নালের মাঝখানে ছোটখাটো যে খালগুলো আছে, মরা যে নদী আছে— যেমন, মানস নদী, বহু বৎসর আগে কাটা বাগুরিয়া খাল যেটি এখন শুকিয়ে খটখটে, তারপর ঘাঘট নদী থেকে বেরিয়ে আসা কয়েকটি খাল, এগুলো কিছু কিছু জায়গায় কেটে যদি পরস্পর মিলিয়ে দেয়া যায়, আধকোশার পানি ধাক্কা মেরে যদি বল্লার চরের সেই খাত বেয়ে এই খালগুলোর ভেতর দিয়ে চলে আসে—

কেটে দিতে পারলে পানি আসবে তো বটেই— তাহলে পুরো জলেশ্বরী একটি দ্বীপের মতো হয়ে যাবে, তার চারদিকে খলখল করে বইবে শুধু পানি আর পানি, পাহাড়ি পানি, ঢল, ঘূর্ণি; সেই দ্বীপের ভেতরে তখন আটকে পড়বে পাকিস্তান তার পুরো বাহিনী নিয়ে।'

মহিউদ্দিন হাতের কঞ্চি দিয়ে মাটির ওপরে আঁকা ঘোড়ার নালের দু'টি মুখ এখন এক করে দেয় দ্রুত একটি খোঁচায় এবং উৎসুক চোখে প্রত্যেকের দিকে তাকায়।

কেউ কিছু বলে না; নিশ্বাস স্তম্ভিত প্রত্যেকের, যেন তারা ইতোমধ্যেই শত্রুর অবরুদ্ধ অবস্থা স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করতে পারছে।

অবিলম্বে মহিউদ্দিন যোগ করে, 'আধকোশা নদীর এই ভীষণ মূর্তি আমরা সকলেই জানি, আর এটাও জানি যে, মাত্র এক রাতের ভেতরেই আধকোশা একটা মরা নদী থেকে কত হিংস্র একটি স্রোতে পরিণত হয়। পাকিস্তানি মিলিটারিরা ভালো করে কিছু বুঝে ওঠার আগেই আটকা পড়ে যাবে, এদিন ভোরে উঠে তারা দেখবে জলেশ্বরী থেকে পালাবার কোনো পথ তাদের নেই। ছোটবেলার কথা আমাদের মনে পড়বে— কত রাতে আমাদের ঘুম ভেঙে গেছে নদীর খলখল শব্দ শুনে, হঠাৎ, শেষরাতে। আধকোশার পাড়ে আমরা ছুটে গিয়েছি তার সেই ভয়াল পানির তোড় দেখতে। মনে নেই?'

স্মৃতি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে মাহিউদ্দিনের সঙ্গীদের মনে, নীরব হাসিতে ঝলমল করে ওঠে তাদের মুখ।

'আমরা কি দেখিনি, বিরাট ধস ভাঙতে? গতকালও যেখানে আমরা ঘর দেখেছি, গাছ দেখেছি, আমরা কি সেখানে গিয়ে প্রবল পানির পাগল ঘূর্ণি দেখিনি? আমরা এই নদীর পাড়ে জন্ম নিয়েও কি নদীর এই মূর্তি দেখে ভয় পাইনি? দেখিনি, যেখানে দাঁড়িয়ে নদীর এই তাণ্ডব দেখেছি, পায়ের নিচে সেই মাটিও দুলে উঠতে, চিড় ধরতে? আমরা কি চিৎকার করে তখন ছুটে পালাইনি?'

মহিউদ্দিনের প্রতিটি প্রশ্নের আঘাতে বিস্তৃত হয় প্রত্যেকের হাসি, উজ্জ্বলতর হয় চোখের আলো; অন্য কালে যে স্মৃতি আবার তাদের আতঙ্কিত করতে পারত, এই গ্রীষ্মে সেই স্মৃতিই তাদের সাহসী করে তোলে।

মহিউদ্দিন হাতের কঞ্চিটিকে ধনুকের মতো বাঁকায়, এক সময়ে হঠাৎ সেটি ভেঙে যায়। ভ্রু কুঁচকে একবার সেই ভাঙা টুকরো দু'টির দিকে তাকিয়ে থাকে মহিউদ্দিন; তারপর বলে, 'গেরিলার অস্ত্র নেই, শত্রুর আছে অস্ত্র,

অনেক উন্নত তার অস্ত্র। গেরিলার লোকবল নেই, শত্রুর সৈন্যসংখ্যা অনেক, উন্নত প্রশিক্ষণ তাদের আছে। গেরিলার শুধু, একটিই সুবিধে সে নিজের মাটিতে দাঁড়িয়ে আছে, যোদ্ধা-অযোদ্ধা দেশকে যারাই ভালোবাসে তারাই তার অস্ত্র, তারাই তার লোকবল; শত্রু নিজের মাটিতে দাঁড়িয়ে নেই, বাইরে থেকে সে এসেছে, তার প্রধান মনোভাব অবিশ্বাস ও সন্দেহ। শত্রুকে ঘায়েল করবার জন্য গেরিলাকে এই পরিস্থিতিতে নির্ভর করতে হয়, আমার ধারণা, দু'টি দিকের ওপর। শত্রুকে সুযোগ দাও তার নিজের অবিশ্বাস আর সন্দেহ কাটিয়ে উঠতে, এমন পরিবেশ সৃষ্টি করো যেন সে নিরাপদ বোধ করে, সফল হয়েছে বলে অনুভব করে; যখন সে সমস্ত কিছুই স্নিগ্ধ মনে করছে, চমৎকার বলে ভাবছে, অতর্কিতে তাকে আক্রমণ করো; যখন সে আর সতর্ক প্রস্তুত নয়, যখন সে আশঙ্কা করছে না কিছুই, আকাস্মিকভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ো তার ওপর। গেরিলার সবচেয়ে বড় অস্ত্র এই আকস্মিকতা। আধকোশা আকস্মিকভাবেই প্রবল এক নদী হয়ে যায়। আধকোশা আমাদের সবচেয়ে বড় গেরিলা।'

আলম মনে মনে বড় বিস্ময় অনুভব করে মহিউদ্দিনের কথাগুলো শুনে। বক্তব্য তাকে বিস্মিত করে না, সে বিস্মিত হয় বক্তার কথা ভেবে। আলম ইতস্তত করে বলেই ফেলে, 'মহিভাই, আপনি এত জানেন!'

'কী জানি রে, আলম?'

'এই যে বললেন, গেরিলাদের কথা, মনে হয় আপনি সেই কবে থেকে গেরিলা, কত যুদ্ধ করেছেন, কত আপনার অভিজ্ঞতা। অথচ আপনাকে চিরকাল দেখলাম ফুটবল খেলতে, আর এই দু'বছর থেকে কলেজে পড়াতে।'

ব্রিটেনের শ্রমিক দলের একজন নেতা ডোনাল্ড চেসওয়ার্থ অচিরেই বলবেন, 'স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশকে কেউ রুখতে পারবে না। পাকিস্তানি সশস্ত্র বাহিনী বাঙালিদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে একটাই কাজ করতে পেরেছে— রাতারাতি তারা গেরিলাদের জন্ম দিয়েছে, মানুষকে যোদ্ধা করে তুলেছে। আমি ফরাসিদের বিরুদ্ধে আলজেরীয় গেরিলাদের লড়তে দেখেছি। আমার মনে হয়েছে, বাঙালি গেরিলারা আলজেরিয়ার গেরিলাদের চেয়েও অনেক নিপুণ ও মনোবলসম্পন্ন।'

মহিউদ্দিন কঞ্চির টুকরোটা আলমের দিকে হাসতে হাসতে ছুড়ে দিয়ে বলে, 'কেন, তুই জানিস না, আমি কত যুদ্ধ করেছি? কিউবায় আমি ছিলাম, ভিয়েতনামে তো এই সেদিনও লড়ে এলাম, তুই কোনো খবরই রাখিস না?'

আলম জানে এর একটি বর্ণও সত্যি নয়, তার সন্দেহ হয় সে বোকা বলেই তাকে আরও বোকা বানাচ্ছে মহিউদ্দিন, তবু মনের ভেতরে কোথায় যেন বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় যে, তার মহিভাই যা বললেন তা ষোলোআনাই সত্যি; কিছু ঠাহর করতে না পেরে সে ফ্যালফ্যাল করে মহিউদ্দিনের দিকে তাকিয়ে থাকে।

সুলতান আবার খুকখুক করে হেসে ওঠে; তার দিকে তাকিয়ে মহিউদ্দিন এবার তাকে ধমক দেয় না, বরং নিজেই সে হাসতে থাকে। তারপর দু'হাত দু'দিকে ছড়িয়ে দিয়ে বলে আলমকে, 'দূর বোকা। এসব কি জানতে হয়? এসবের কি অভিজ্ঞতা থাকে কারো? পানিতে পড়েই সাঁতার শেখে মানুষ।'

পানির কথায় আবার আধকোশার কথা মনে পড়ে যায় সবার।

মাটিতে আঁকা নকশার দিকে মহিউদ্দিন তাকায়, তাকিয়ে থাকে কিছুক্ষণ এবং সেদিকে তাকিয়ে থেকেই সে শুনতে পায় তার সঙ্গীরা প্রায় সমস্বরে বলছে, 'আমরা তাহলে বৃষ্টির জন্য অপেক্ষা করব।'

মহিউদ্দিন চোখ তুলে তাদের দিকে তাকায়, প্রত্যেকের দিকে আলাদা করে তাকায় সে, তারপর আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করে, এবং সেদিকে তাকিয়ে থেকেই সে বলে, 'আমরা বৃষ্টির জন্য অপেক্ষা করব।'

মহিউদ্দিন উঠে দাঁড়ায়। এবং উঠে দাঁড়াবার সময় তার বুকের ভেতরে একটি শূন্যতা সে অনুভব করে।

মহিউদ্দিন বলে, 'বশীরকে জলেশ্বরী পাঠলাম, এখনও এলো না?'

সঙ্গীরা ঈষৎ চঞ্চল বোধ করে সহসা। পরস্পর চকিত দৃষ্টি বিনিময় করে তারা।

মহিউদ্দিন সেই দৃষ্টি বিনিময় লক্ষ করে এবং তার মনে হয়, বশীরের নিরাপত্তার জন্য তারা হঠাৎ শঙ্কিত হয়ে পড়েছে। মহিউদ্দিন চোখে নিষেধ এবং অভয় এঁকে উচ্চারণ করে, 'ঘাবড়াচ্ছিস কেন? বশীর ঠিক ফিরে আসবে।'

৩

গোলাবাড়ির দিকে যেতে যেতে মহিউদ্দিন আকাশের দিকে তাকায়। বৃষ্টির মৌসুম এখনও ছ'সপ্তাহ পরে। অকস্মাৎ তার স্মরণ হয়, বৃষ্টি সে আদৌ পছন্দ করে না এবং বাঙালি হয়ে বৃষ্টি তার ভালো লাগে না—এর জন্য গোপনে সে বহুদিন থেকে নিজেকে অপরাধী বোধ করে আসছে।

মহিউদ্দিন একেবারে দৃষ্টির আড়াল হয়ে যাবার সঙ্গে সুলতান আবার সেই খুকখুক করে হেসে ওঠে।

সুলতান আবার কী কারণে হাসে, মনের মধ্যে কোন কথা বুঝে হাসে, কেউ ঠিক শনাক্ত করতে পারে না, কারো কারো চোখে পড়ে সুলতানের চোখ; সে চোখে কিসের যেন ঘোর একটা ইশারা; কাউকে অধঃপতিত হতে দেখলে, মানুষের চোখে যেমন ঝিলিক দেখা যায়, তেমনি একটা ঝিলিক।

অকস্মাৎ প্রলয় ঘটে যায়। সুলতানের পশ্চাদ্দেশে গদাম করে একটা লাথি কষিয়ে দেয় আলম।

'ইয়ারকি?'

সুলতান হকচকিয়ে যায় প্রথমে, প্রায় উপুড় হয়ে পড়ে যেতে যেতে নিজেকে সামলে নিয়েই সে ঝাঁপিয়ে পড়ে আলমের ওপর। আজমত, অবিনাশ, সাত্তার ও হায়দার তৎক্ষণাৎ একজোটে দু'জনকে তফাত করে না দিলে হাড়গোড় ভাঙা বিচিত্র কিছু ছিল না।

আলম ফুঁসতে ফুঁসতে বলে 'বুঝি না? বুঝি না, হাসি আসে কিসে?'

আলমই অচিরে বিস্তারিত করে দেয়। 'ফুলকির জন্য তো? ফুলকির কথা নিয়ে ফের শালা কেউ হাসবে তো আমি খুলি উড়িয়ে দেব।'

সুলতানও কম যায় না। সে তীব্র স্বরে বলে ওঠে, 'এইও, খুলি ওড়াবে? দু'দিনের বাচ্চা, রাইফেল ধরতে শিখেছ? নতুন নতুন অস্ত্র হাতে পেলে ও-রকম সুড়সুড়ি হয়।'

স্তম্ভিত হয়ে যায় সকলে। রাইফেলের উল্লেখে একটি বিস্ফোরক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

আলম ও সুলতান পরস্পরের দিকে তীব্র চোখে তাকিয়ে থাকে এবং অন্যান্যদের ভেতরে নিঃশব্দে দৃষ্টি বিনিময় হয়ে যায়। হায়দার মাথার ঈষৎ অবনত ভঙ্গি করবার সঙ্গে সঙ্গে সাত্তার লাফ দিয়ে সুলতানকে ধরে এবং টানতে টানতে অকুস্থল থেকে সরিয়ে নিয়ে যায়। বাঁশবনের ভেতর দিয়ে তাদের অপসৃয়মাণ সংলাপ শোনা যায়। সুলতান কিছুতেই সঙ্গে যেতে চায় না সাত্তারের, সাত্তার চাপাস্বরে ধমকাতে তাকে চোখের আড়ালে নিয়ে যায়।

হায়দার বলে, 'ছি, তুই কী করলি বল তো ?'

আলম গুম হয়ে বসে থাকে।

অবিনাশ বলে, 'কিছুর মধ্যে কিছু না। ফুলকির কথা হঠাৎ কোত্থেকে এল? আর রাইফেলই বা আসে কেন?'

আলম ক্রুদ্ধ চোখ তুলে বলে, 'আসে কেন? জানো না? জানো না যে, আজ এক বছর থেকে ফুলকির পেছনে লেগেছে ঐ শালা সুলতান?'

আজমত অবিশ্বাসের হাসি হেসে ওঠে। বলে, 'যাহ্, হতেই পারে না। আমরা কেউ কিছু জানি না। বললেই হলো? আমরা সকলেই জানি, মহিভাই